বাংলাদেশের কৃষি

ইউনিট ৭

ভূমিকা

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। অর্থনীতির অন্যান্য খাতের প্রবৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে বেশি হওয়ায় অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব পূর্বের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। তবুও একক খাত হিসেবে কৃষির অবদান এখনও সবচেয়ে বেশি। তাই এই খাতের প্রবৃদ্ধি, প্রবৃদ্ধির কারণ ও প্রকৃতি, সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। কিন্তু কৃষি খাতের উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত সকল বিষয়ে এখানে আলোচনা করা হবে না। এই খাতের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শুধু প্রাথমিক আলোচনা করা হবে।

পাঠ - ১ : বাংলাদেশের কৃষির সমস্যা ও সমাধান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশের কৃষির সমস্যা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশের কৃষির সমস্যার সমাধান সম্পর্কে বলতে পারবেন।

৭.১.১ বাংলাদেশের কৃষির সমস্যা

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। কিন্তু এখানে কৃষির আশানুরূপ উন্নয়ন হয়নি। এজন্য অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় আমাদের কৃষি ফসলের একর প্রতি ফলন কম। নিচে কৃষির সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

১. **আধুনিক প্রযুক্তির কম ব্যবহার :** উন্নতমানের বীজ, সার, সেচ ও কীটনাশক ব্যবহার করে কৃষির ফলন বাড়ানো যায়। কিন্তু বাংলাদেশে আধুনিক প্রযুক্তির আশানুরূপ প্রসার ঘটেনি। ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির কিছু প্রসার ঘটেছে। কিন্তু অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রে এর প্রসার অত্যন্ত কম বা নেই বললেই চলে।

২. **কৃষি ঋণের অভাব :** আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য নগদ অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু অধিকাংশ কৃষকই দরিদ্র বলে তাদের নগদ অর্থের অভাব থাকে। কৃষক ঋণ নিয়ে উপকরণ কিনতে পারে। কিন্তু সংগঠিত উৎস থেকে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম। তাই কৃষকেরা প্রয়োজনীয় ঋণ পায় না। এক হিসেবে দেখা যায় শতকরা ৮০ ভাগ কৃষক যাদের ০.৫০ একরের কম জমি আছে তারা কৃষি ঋণ পায় না। কৃষক অসংগঠিত উৎস থেকে ঋণ নিতে পারে। কিন্তু এই প্রকার সুদের হার এত বেশি যে এই সুদে ঋণ নিয়ে ফসল উৎপাদন লাভজনক হয় না।

৩. **অপর্যাপ্ত উপকরণ সরবরাহ :** আধুনিক প্রযুক্তি অত্যন্ত সংবেদনশীল। ঠিক সময়মত সার, সেচ ও কীটনাশক ব্যবহার না করলে ফলন খুব কম হয়। অনেক সময় বাজারে সার ও

কীটনাশকের অভাব দেখা দেয়। কখনও জ্বালানীর অভাবে সেচের অসুবিধা দেখা দেয়। এসব কারণে কৃষক আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত বোধ করে।

৪. **ক্রটিপূর্ণ বিপণন ব্যবস্থা :** বাংলাদেশে কৃষক কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থায় ক্রটির জন্য ফসলের যে দাম পায় তাতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার অনেক সময় পোষায় না। নগদ অর্থের জরুরী প্রয়োজন মেটানোর জন্য অধিকাংশ ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক ফসল তোলার পর পরই ফসল বিক্রয় করে ফেলে। সে সময় ফসলের দাম কম হয় বলে তারা ভাল দাম পায়না। এছাড়া গুদামঘরের অভাব, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার স্বল্পতার জন্যও তারা ফসলের প্রত্যাশিত দাম পায় না।

৫. **অভাব :** বাংলাদেশের জনগণ অধিকাংশই দরিদ্র বলে তাদের ক্রয়ক্ষমতা কম। এজন্য কৃষি পণ্যের চাহিদা আশানুরূপ হারে বাড়ে না। ফলে ফসলের দাম কম হয়।

৬. **কম উৎপাদনশীলতা :** আমাদের কৃষির উৎপাদনশীলতা কম। ফলে অনেক ফসলের উৎপাদন খরচ বেশি পড়ে। এসব পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে তুলনামূলকভাবে কম দামে পাওয়া যায়। অবাধ আমদানি নীতির ফলে কিংবা প্রায় উন্মুক্ত আন্তর্জাতিক সীমান্ত হওয়ার ফলে এসব সস্তা পণ্য দেশে আসে এবং প্রতিযোগিতায় দেশীয় পণ্য মার খায়।

৭. **পরিবেশগত অবনতি :** বাংলাদেশে নানাবিধ কারণে পরিবেশগত অবনতি ঘটছে। যেমন – অতিরিক্ত হারে গাছপালা কাটা, জলাভূমি চাষের আওতায় আনা, ভারসাম্যহীন সার ব্যবহার, ক্রটিপূর্ণ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি কারণে জমির উর্বরতা শক্তি কমে যাচ্ছে এবং জলাবদ্ধতা ও লবাণক্ততা সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

৮. **প্রাকৃতিক দুর্যোগ :** বাংলাদেশের কৃষির উপর প্রকৃতির প্রভাব খুব বেশি। যখন প্রকৃতি অনুকূল থাকে তখন কৃষি ফলন ভাল হয়। কিন্তু বন্যা, খরা, কীটপতঙ্গের আক্রমণ প্রভৃতি কারণে ফসলের মারাত্মক ক্ষতি হয় এবং সার্বিকভাবে কৃষি বিপর্যস্ত হয়।

৯. **উপযুক্ত কৃষি নীতির অভাব :** বাংলাদেশ সরকারের অনুসৃত কৃষি নীতি কৃষি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে এই নীতির কিছু কিছু বিষয় উন্নতির অন্তরায় হিসেবে কাজ করেছে।

৭.১.২ বাংলাদেশের কৃষি সমস্যার সমাধান

বাংলাদেশের কৃষি নানাবিধ সমস্যার কারণে অনুন্নত। কৃষির উন্নতির জন্য এসব সমস্যা সমাধান করা দরকার। কৃষির এসব সমস্যা দূর করার উপায়সমূহ নিচে আলোচনা করা হল :

১. **আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি :** কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তবে লক্ষ রাখতে হবে যেন প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে শ্রমের সার্বিক ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। নাহলে কৃষিতে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাবে।

২. **কৃষি ঋণের ব্যবস্থা :** কৃষির উপকরণসমূহ সময়মত কেনার জন্য কৃষককে সহজ শর্তে ও সরল পদ্ধতিতে ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকেরা যাতে ঋণ পায় সে ব্যবস্থা করা দরকার।

৩. **পর্যাপ্ত উপকরণ সরবরাহ :** বর্তমানে সার, সেচযন্ত্র, জ্বালানী, কীটনাশক ওষুধ, বীজ প্রভৃতি ব্যক্তিগত খাতের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়। এসব উপকরণ যাতে কৃষকেরা সময়মত পায় এবং উপকরণের গুণগত মান ও দাম সঠিক হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

৪. **বিপণন ব্যবহার উন্নতি :** কৃষক পণ্য বিক্রয় করে যে দাম পায় তা যেন লাভ নিশ্চিত করে সেজন্য বিপনন ব্যবস্থার উন্নতি করা দরকার। শস্য গুদামজাত করার জন্য ঋণ দান, গুদামঘর নির্মাণ, হিমাগার নির্মাণ, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধি ইত্যাদি ব্যবস্থার দ্বারা বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা যায়। এছাড়া পণ্যের নতুন ধরনের ব্যবহার প্রবর্তন করা যায়। এক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে যেন নতুন পণ্যটি ভোক্তার রুচিমাফিক হয়।

৫. **ভূমি সংস্কার :** সরকারী খাস জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করে উৎপাদন বাড়ানো যেতে পারে।

৬. **শস্য বহুমুখীকরণ :** বাংলাদেশের কৃষিতে গুটিকতক পণ্য খুব বেশি গুরুত্ব পায়। ইতিপূর্বে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য ধান ও গম, বিশেষতঃ ধান উৎপাদনে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কিন্তু কৃষির উন্নয়নের জন্য আলু, তৈলবীজ, পাট, ফুল ও লতাপাতা ইত্যাদির চাষ বাড়ানো দরকার।

৭. **টেকসই কৃষি :** কৃষি উৎপাদনের উপর অত্যধিক জোর দেয়ার ফলে ভূমির উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে এবং পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। কৃষিতে সার, সচে ও কীটনাশকের এবং ফসলের প্যাটার্ন এমন হতে হবে যাতে কৃষির টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হয়।

৮. **প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা :** বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি কারণে কৃষির উৎপাদন যাতে কম ক্ষতিগ্রস্থ হয় সেজন্য ব্যবস্থা নেয়া দরকার। বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসন ব্যবস্থা এবং শুকনো মওসুমে চাষের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বন্যার ক্ষতি কমানো যায়।

৯. **ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি :** কৃষির উন্নয়নের জন্য অকৃষিখাতের উন্নয়ন করা দরকার যাতে কৃষিপণ্য কেনার জন্য ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

১০. **কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ :** কৃষি গবেষণার মাধ্যমে উন্নত জাতের এবং বন্যা ও খরা সহনশীল বীজ উদ্ভাবন করা দরকার। কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থার মাধ্যমে এই জাতের বীজের ব্যবহার এবং টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা দরকার।

১১. **বাণিজ্য :** কৃষিপণ্যের রপ্তানি উৎসাহিত করার দরকার। রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ দান অবকাঠামো নির্মাণ ও বাজারজাতকরণ সুবিধা সৃষ্টি করা দরকার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

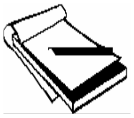

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। নিচের কোনটি কৃষির সমস্যা নয় –
ক. আধুনিক প্রযুক্তির কম ব্যবহার খ. ত্রুটিপূর্ণ বিপণন ব্যবস্থা
গ. উদ্যোক্তার অভাব ঘ. পরিবেশগত অবনতি

২। কৃষির উন্নতির জন্য নিচের কোন ব্যবস্থাটি নেয়া যায় –
ক. কৃষি ঋণ মওকুফ খ. বন জঙ্গল কেটে ফেলা
গ. বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ ঘ. কৃষি গবেষণা ও কৃষি সম্প্রসারণের উন্নতি বিধান

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক. কৃষির চারটি সমস্যা লিখুন।

খ. কৃষির সমস্যা সমাধানের চারটি উপায় লিখুন।

পাঠ - ২ : জমির খন্ডবিখন্ডতা ও বিচ্ছিন্নতা : কারণ ও ফলাফল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- জমির খন্ডবিখন্ডতা ও বিচ্ছিন্নতা কাকে বলে বলতে পারবেন।
- জমির খন্ডবিখন্ডতার কারণ ও ফলাফল বলতে পারবেন।

জমির খন্ডবিখন্ডতা ও বিচ্ছিন্নতা

জমির খন্ডবিখন্ডতা বলতে এক খন্ড জমি ক্রমশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খন্ডে বিভক্ত হওয়াকে বুঝায়। জমির বিচ্ছিন্নতা বলতে একজন কৃষকের জমি একই স্থানে অবস্থিত না হয়ে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকাকে বুঝায়। অনেকের মতে, জমির খন্ডবিখন্ডতা ও বিচ্ছিন্নতা বাংলাদেশের কৃষির একটি প্রধান সমস্যা।

জমির খন্ডবিখন্ডতা ও বিচ্ছিন্নতার কারণসমূহ

বাংলাদেশে কৃষি জমি খন্ডবিখন্ড এবং একই কৃষকের জমি বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত। এই খন্ডবিখন্ডতা ও বিচ্ছিন্নতার কারণসমূহ নিচে আলোচনা করা হল :

১. **উত্তরাধিকার আইন :** বাংলাদেশের উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে তার সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। এভাবে ক্রমাগত ভাগ হওয়ার ফলে জমি খন্ডবিখন্ড ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

২. **কৃষকদের দারিদ্র :** কৃষক তার আর্থিক দুর্দশার কালে অনেক সময় জমির একাংশ বিক্রয় করে ফেলে। এভাবে বার বার বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে জমি বিক্রয় করার ফলে জমি খন্ডবিখন্ড হয়।

৩. **উর্বরতার পার্থক্য :** বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত জমির মধ্যে উর্বরতার পার্থক্য থাকে এবং বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের উপযোগী হয়। উত্তরাধিকারীদের মধ্যে জমি বন্টিত হওয়ার সময় বিভিন্ন উর্বরতা সম্পন্ন জমি সমানভাগে ভাগ করা হয়। ফলে জমি খন্ডবিখন্ড ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

৪. **অর্থনৈতিক কারণ :** জমির খন্ডবিখন্ডতা ও বিচ্ছিন্নতা উপরোক্ত কারণে ঘটলেও তা গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করে। বাংলাদেশের কৃষি জমি মোটামুটি সমতল হলেও একেবারে সমতল নয়। ফলে বিভিন্ন উচ্চতায় অবস্থিত জমির পানি ধরে রাখার জন্য আইলের দরকার হয়। জমিতে যে সার ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য দেওয়া হয় তা পানির সঙ্গে নিচু বা অন্যের জমিতে চলে যেতে পারে। সেসব যেন নির্দিষ্ট জমিতে থাকে এজন্যও আইলের দরকার হয়।

৫. **অন্যান্য কারণ :** জমির মালিকানায় সীমানা চিহ্নিত করার জন্য আইলের প্রয়োজন হয়। এছাড়া ব্যক্তিগতভাবে ও শারীরিকভাবে উদ্ভিদের তত্ত্বাবধান করার জন্য ও ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত জমি অধিক উপযোগী হয়।

জমির খন্ডবিখন্ডতা ও বিচ্ছিন্নতার ফলাফল

কৃষিতে জমির খন্ডবিখন্ডতা ও বিচ্ছিন্নতার প্রভাব নিরঙ্কুশভাবে ভাল বা খারাপ কোনটিই নয়। নিচে এর ফলাফল আলোচনা করা হল :

১. **সময় অপচয় ও তত্ত্বাবধানের অসুবিধা :** বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা জমিতে চলাচল করতে কৃষকের কিছু সময় নষ্ট হয়। তাছাড়া বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত জমিগুলোর তত্ত্বাবধান করাও অসুবিধাজনক হয়।

২. **জমির অপচয় :** জমিতে আইল দেয়ার ফরে কিছু জমি নষ্ট হয়। এজন্য পানি ধারণের জন্য বা সশরীরে তত্ত্বাবধানের জন্য জমির খন্ড যেরূপ হওয়া উচিত তার চেয়ে বেশি খন্ড অপচয়মূলক।

৩. **আধুনিক প্রযুক্তির উপযোগী :** পূর্বে মনে করা হত যে খন্ডবিখন্ড জমি আধুনিক চাষবাসের উপযোগী নয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার জমির খন্ডতা একান্ত প্রয়োজনীয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

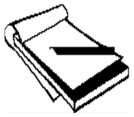

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। নিচের কোন্‌টির জন্য জমির খন্ডবিখন্ডতা ও বিচ্ছিন্নতা ঘটে?
ক. কৃষককে ঋণ না দেয়া খ. প্রকৃতির উপর কৃষির নির্ভরশীলতা
গ. জমির উর্বরতার পার্থক্য ঘ. দুর্বল অবকাঠামো

২। জমির খন্ডবিখন্ডতা ও বিচ্ছিন্নতার ফলাফল নয় কোনটি?
ক. উৎপাদন কাজ তত্ত্বাবধানের অসুবিধা খ. কৃষকের পুষ্টিহীনতা
গ. জমির অপচয় ঘ. কৃষকের সময়ের অপচয়

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক. জমির খন্ডবিখন্ডতা ও বিচ্ছিন্নতা বলতে কি বুঝায়?
খ. খন্ডবিখন্ডতা ও বিচ্ছিন্নতার কারণ লিখুন।

পাঠ - ৩ : বর্তমান ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা — এর ত্রুটিসমূহ, কৃষি উৎপাদনে এর প্রভাব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা বলতে কি বুঝায় বলতে পারবেন।
- ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ এবং কৃষি উৎপাদনে এর প্রভাব বলতে পারবেন।

ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা

ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা বলতে ভূমির উপর নিয়ন্ত্রণের অধিকার ও ধাঁচকে বুঝায়। এই অধিকারের মধ্যে জমি ব্যবহার করার এবং ব্যবহার না করার অধিকার, ভূমি থেকে উৎপাদিত দ্রব্যের উপর অধিকার এবং ভূমি অথবা উৎপাদিত দ্রব্য অন্যের কাছে হস্তান্তর করার অধিকার অন্তর্ভুক্ত থাকে। ভূমির উপর অধিকার গ্রামাঞ্চলে মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা অনেকাংশে নির্ধারণ করে।

বাংলাদেশে বর্তমান ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা

বাংলাদেশে বর্তমান ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা ১৯৫০ এর পূর্ববঙ্গ জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইনের ফল। এই আইনের বলে রায়ত জমির পূর্ণ স্বত্ব লাভ করে। এই স্বত্ব স্থায়ী, বংশানুক্রমিক ও হস্তান্তরযোগ্য। পরবর্তীকালে ১৯৭২ ও ১৯৮৪ সালের ভূমি সংস্কার নীতি এবং বিভিন্ন সময়ে ভূমিস্বত্ব সম্পর্কিত জারীকৃত সরকারী আইনের মাধ্যমে ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা বর্তমান রূপ নেয়। ভূমিস্বত্বের ভিত্তিতে আইনের মাধ্যমে ভূমিস্বত্ব ভিত্তিতে বর্তমানে ৪ রকম কৃষক পরিবার দেখা দেয় :

ক. **মালিক কৃষক** – যারা নিজেই নিজের জমি চাষ করে। কাউকে বর্গা দেয়না বা কারো কাছ থেকে বর্গা নেয়ও না।

খ. **মালিক বর্গা কৃষক** – যারা নিজের জমি চাষ করে। কিন্তু প্রয়োজনে অন্যের জমি বর্গা নেয় কিংবা নিজের জমি বর্গা দেয়।

গ. **বর্গাচাষী** – যারা অন্যের জমি বর্গা নিয়ে চাষ করে।

ঘ. **অনুপস্থিত ভূস্বামী** – যারা নিজে জমি চাষ করেনা। বিভিন্ন শর্তে অন্যকে দিয়ে নিজের জমি চাষ করায়।

১৯৯৬ সালের এক উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে কৃষক পরিবারের শতকরা ৬.৪ অংশ মালিক কৃষক এবং এরা ৫৮.৪% জমির মালিক। মালিক বর্গা কৃষক পরিবারের সংখ্যা শতকরা ৩৫.৫ অংশ এবং এরা ৩৯.৭% ভূমির মালিক।

বর্গাচাষী পরিবারের সংখ্যা শতকরা ৩.৫ ভাগ এবং এদের চাষাধীন জমির পরিমাণ মোট জমির ১.৯%।

বর্তমান ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ

বাংলাদেশের বর্তমান ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ নিচে আলোচনা করা হল :

১. **জমির অসম বন্টন :** বাংলাদেশের ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য ত্রুটি হল জমির অসম বন্টন। ১৯৯৫ সনের এক উপাত্ত থেকে দেখা যায় শতকরা ৪ ভাগ কৃষক পরিবার (যেসব পরিবারের মালিকানাধীন জমির পরিমাণ ৭.৫ একরের বেশি) মোট জমির ২০.৭ অংশের মালিক। অন্যদিকে শতকরা ৭২.৭ ভাগ কৃষক পরিবার শতকরা ৩৬.৮ ভাগ জমির মালিক।

২. **ভূমিহীন কৃষক :** ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার আরেকটি ত্রুটি হল ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক বিভিন্ন কারণে জমি হারিয়ে ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হচ্ছে।

৩. **বর্গাচাষ :** ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার আরেকটি ত্রুটি হল বর্গাচাষ। ভূমি সংস্কার আইনে বর্গাচাষীদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও বাস্তব ক্ষেত্রে এই আইনের প্রয়োগ হয় না। ফলে বর্গাচাষীরা তাদের অধিকার সম্পর্কে অনিশ্চয়তায় ভোগেন।

৪. **অনুপস্থিত মালিক :** কৃষি জমির অনুপস্থিত মালিকগণ বগাধারী বা রায়তওয়ারী ব্যবস্থায় জমি চাষ করান। এর ফলে জমির উৎপাদনশীলতা বাড়েনা। তছাড়া অনুপস্থিত কৃষক জমি কেনার ফলে জমির চাহিদা বাড়ে এবং ফলে দাম বাড়ে। ক্ষুদ্র কৃষক উঁচু দামে জমি কিনতে সক্ষম হয়না।

কৃষি উৎপাদনে ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার প্রভাব

কৃষি উৎপাদনে ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার প্রভাবসমূহ নিচে আলোচনা করা হল।

১. **কম উৎপাদন :** ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার ফলে জমির অসম বন্টন হয়। বড় কৃষক ও মাঝারি কৃষকেরা ঋণ ও অন্যান্য সুবিধা পায়। কিন্তু ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকেরা ঋণের কাম্য সুবিধা পায়না। ফলে উৎপাদন আশানুরূপ হয়না। তবে বাংলাদেশে উফশী প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা যায় ক্ষুদ্র কৃষকেরাও এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে।

২. **উন্নয়ন কর্মসূচীর সুবিধা :** অসম ভূমি বন্টন অসম আয়ের জন্ম দেয়। আয় ও সম্পদের অসমতা গ্রামাঞ্চলে একটি ক্ষমতা কাঠামো তৈরি করে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বড় কৃষকদের হাতে থাকে। এর ফলে উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর সুবিধা ছোট কৃষক অপেক্ষা বড় কৃষকেরা বেশি ভোগ করতে পারে। ফলে কৃষি উৎপাদনের উপর উন্নয়নের সার্বিক প্রভাব কম হয়।

৩. **বর্গাচাষ :** বর্গাচাষ প্রথার ফলে জমির অপেক্ষাকৃত ভাল ব্যবহার হয়। অর্থাৎ উদ্বৃত্ত জমি মালিক নিজে যে ব্যবহার করতে সক্ষম বর্গাচাষী তার চেয়ে ভাল ব্যবহার করে। এজন্যই মালিক বর্গাচাষীকে জমি বর্গা দেয়। কিন্তু বর্গাচাষীর কার্যকরী আইনগত নিরাপত্তা না থাকায় সে সর্বোত্তম উপকরণ ব্যবহার করে না। ফলে উৎপাদন কম হয়।

৪. **অনুপস্থিত মালিক :** অনুপস্থিত মালিক অনেক সময় তদারককারী ও শ্রমিক দ্বারা জমি চাষ করায়। ব্যক্তিগতভাবে তত্ত্বাবধান না করায় শ্রমিক কম কাজ করতে পারে এবং ফলে উৎপাদন কম হয়।

৫. **বিপণন :** ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক ফসলের উপর দাদন নিতে পারে। কিংবা অর্থের প্রয়োজনে ফসল তোলার সঙ্গে সঙ্গে তা বিক্রয় করে দেয়। ফলে সে ফসলের লাভজনক দাম পায় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

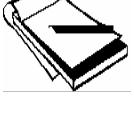

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার ত্রুটি?
ক. উফশী প্রযুক্তির ব্যবহার করতে না পারা খ. বর্গাচাষ প্রথার বিদ্যমানতা
গ. পরিবহণ ব্যবস্থার অনুন্নয়ন ঘ. সেচ সুবিধা বৃদ্ধির অন্তরায়

২. নিচের কোনটি কৃষি উৎপাদনে ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার প্রভাব?
ক. কৃষি উৎপাদন কম হওয়া খ. জমির দাম কম হওয়া
গ. জমির দাম বেশি হওয়া ঘ. জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাওয়া

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক. ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা বলতে কি বুঝায়?

খ. ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার দুইটি ত্রুটি লিখুন।

পাঠ - ৪ : কৃষির আধুনিকীকরণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- কৃষির আধুনিকীকরণ কাকে বলে বলতে পারবেন।
- কৃষির আধুনীকিকরণের পথে সমস্যাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

কৃষির আধুনিকীকরণ

কৃষি আধুনিকীকরণ বলতে কৃষিতে ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষিকাজের বিভিন্ন পর্যায়ে আধুনিক প্রযুক্তি ও আধুনিক উপকরণের দক্ষ ব্যবহার বুঝায়। কৃষির আধুনিকীকরণের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত :

১. জমি চাষ, পানি সেচ, কীটনাশক প্রয়োগ, ফসল মাড়াই, গুদাম জাতকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে আধুনিক ও টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার।

২. উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার, সুষম সার ব্যবহার, সেচের দক্ষ ব্যবহার, ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ প্রতিরোধ।

৩. ভূমি সংরক্ষণ ও ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি।

৪. সাধারণ ও কৃষি শিক্ষার মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদন, উপকরণ ব্যবহার ও বিপণন সংক্রান্ত জ্ঞান বৃদ্ধি।

৫. কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর উন্নয়ন।

কৃষির আধুনিকীকরণ সমস্যা

বাংলাদেশে খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণ ঘটেছে। সাম্প্রতিককালে আলু উৎপাদনের ক্ষেত্রেও আধুনিকীকরণ ঘটেছে। কিন্তু অন্যান্য ফসল যেমন – পাট, তেলবীজ, ডাল, শাক-সবজি ইত্যাদির ক্ষেত্রে তেমন আধুনিকীকরণ ঘটেনি। ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রেও আধুনিকীরণের গতি আশানুরূপ দ্রুত নয়। কৃষি আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সমস্যা দেখা যায় :

১. **প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা :** বর্ষা মৌসুমে ধান উৎপাদন বৃষ্টির পানির উপর নির্ভরশীল। এ সময় জমিতে সার ও কীটনাশক ব্যবহার করলে বন্যা বা অতিবৃষ্টির ফলে তার কার্যকারিতা আশানুরূপ হয় না। ফলে এ মৌসুমে আধুনিক কৃষি কম প্রসার লাভ করে।

২. **মূলধন ও ঋণের অভাব :** আধুনিক কৃষি উপকরণ বাজার থেকে কিনে ব্যবহার করতে হয়। এজন্য যে নগদ অর্থের দরকার অনেক কৃষকের তা থাকেনা। আবার জামিনযোগ্য পরিসম্পদের অভাবে সংগঠিত উৎস থেকে ঋণও নিতে পারে না। ফলে তারা আধুনিক উপকরণ আশানুরূপ মাত্রায় ব্যবহার করতে পারে না।

৩. **কৃষকের জ্ঞানের অভাব :** কৃষকের জ্ঞানের অভাবের জন্য সে সুষমভাবে সার ব্যবহার ও সঠিকভাবে কীটনাশক ব্যবহার করতে পারেনা। এর ফলে জমির পুষ্টি উপাদানের ক্ষতি হয় এবং পরবর্তীকালে জমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পায়। কৃষক এজন্য আধুনিক উপকরণের ব্যবহারকে দায়ী করে এবং এটি আধুনিকীকরণের পথে বাধা সৃষ্টি করে।

৪. **উপকরণের মূল্য :** বাংলাদেশ সরকার সার, কীটনাশক, সেচ প্রভৃতির উপর থেকে ভর্তুকি তুলে নেয়ায় এসব উপকরণের বৃদ্ধি পেয়েছে। কোন কোন উপকরণের উপর

আমদানি শুল্ক থাকায় তার দাম বেশি পড়ে। ফলে কৃষক উপকরণ ব্যবহারে কিছুটা নিরুৎসাহিত হয়।

৫. **উন্নতমানের বীজের অভাব :** কৃষির আধুনিকীকরণের অন্যতম প্রধান উপাদান উন্নত জাতের বীজ। বিদেশের উন্নত জাতের বীজ দেশীয় আবহাওয়ায় খাপ খাওয়ানোর পর কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ বিভাগ থেকে তা কৃষকদের ব্যবহারের জন্য বাজারে ছাড়ে। দুর্বল গবেষণার জন্য বাজারে এরূপ নতুন নতুন বীজের ব্যবহার হচ্ছে না।

৬. **বিপণন সমস্যা :** শস্য সংরক্ষণের অসুবিধার জন্য বা নগদ অর্থের প্রয়োজনে কৃষককে ফসল ওঠার পরপরই তা বিক্রয় করে দিতে হয়। ফলে কৃষক ফসলের উৎসাহ ব্যঞ্জক দাম পায় না। কোন বছর অতিরিক্ত ফলন হলে এ সমস্যা আরো তীব্র রূপ নেয়। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার দুর্বলতাও বিপণনের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করে।

৭. **সরকারী নীতির দুর্বলতা :** কৃষির আধুনিকীকরণের জন্য সরকার যে সকল নীতি নেয় তা অনেক সময় সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয় না, যেমন – খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতি। আবার কোন কোন নীতি আধুনিকীকরণের পথে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে, যেমন – কৃষিযন্ত্রের উপর আমদানি শুল্ক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

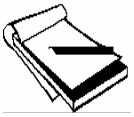

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। কৃষির আধুনিকীকরণ বলতে –
ক. কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বুঝায়
খ. কৃষকের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উন্নতি বুঝায়
গ. বনজঙ্গল কেটে জমি বৃদ্ধি বুঝায়
ঘ. উন্নতমানের দুধ আমদানি করা বুঝায়।

২। কৃষির আধুনিকীকরণের পথে সমস্যা নয় কোনটি?
ক. মূলধন ও ঋণের অভাব　　খ. কৃষকের জ্ঞানের অভাব
গ. সরকারী নীতির দুর্বলতা　　ঘ. দক্ষ শ্রমিকের অভাব

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

ক. কৃষির আধুনিকীকরণ বলতে কি বুঝায়?
খ. কৃষির আধুনিকীকরণের দুটি সমস্যা লিখুন।

পাঠ - ৫ : খাদ্য সমস্যা — কারণ ও প্রতিকার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- খাদ্য সমস্যার কারণ বলতে পারবেন।
- খাদ্য সমস্যা প্রতিকারের উপায়সমূহ বলতে পারবেন।

খাদ্য সমস্যার কারণ

খাদ্যের চাহিদার তুলনায় খাদ্যের যোগান কম হলে যে সমস্যা দেয় তাই খাদ্য সমস্যা। খাদ্যের চাহিদা যে হারে বৃদ্ধি পায় খাদ্যের যোগান তার চেয়ে কম বৃদ্ধি পেলে এ সমস্যা দেখা দেয়। নিচে খাদ্য সমস্যার কারণসমূহ আলোচনা করা হল :

১. **জনসংখ্যা বৃদ্ধি :** বাংলাদেশে জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। পরিবার পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট কর্মসূচীর ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পূর্বের তুলনায় কম হলেও জনসংখ্যা এখনও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২. **আয় বৃদ্ধি :** বাংলাদেশে জাতীয় আয় ধীরগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বর্ধিত আয়ের অধিকাংশই খাদ্যের উপর ব্যয়িত হয়। ফলে খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

৩. **আধুনিক প্রযুক্তির মন্থর গতি :** কৃষকেরা খাদ্য উৎপাদনের জন্য যে হারে আধুনিক উফশী প্রযুক্তি ব্যবহার করছিল ১৯৯০ এর দশকে তার প্রসারের গতি কিছুটা শ্লথ হয়ে আসে। ফলে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার কাছ থেকে দূরে সরে যায়। এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় যে, সার ও সেচ যন্ত্রের উপর থেকে ভর্তুকি তুলে নেয়ার ফলে উৎপাদনের লাভপ্রদতা কমে যাওয়ায় কৃষকেরা বর্তমানে কিছুটা নিরুৎসাহিত। দ্বিতীয়তঃ, ঋণের লভ্যতা কমে যাওয়ায় কৃষকের উপকরণ কেনার ক্ষমতা কমে গেছে। তৃতীয়তঃ, জমিতে কোন কোন পুষ্টি উপাদানের স্বল্পতা দেখা দেয়ায় জমির উৎপাদিকা শক্তি কমে গেছে।

৪. **উন্নত বীজের অভাব :** সরকার বীজের ব্যবসা ব্যক্তিগত খাতে ছেড়ে দেয়ার পর বীজের মান কমে গেছে। তদুপরি উন্নত জাতের নতুন নতুন ধরনের বীজ বাজারে না আসায় উৎপাদন বাড়ছে না।

৫. **কীটপতঙ্গের আক্রমণ :** সারা বছর চাষাবাদ করার ফলে কীটপতঙ্গের আক্রমণ বেড়েছে। কিন্তু কৃষকের অজ্ঞতার জন্য এ ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হয় না।

৬. **খাদ্য সংরক্ষণ :** খাদ্য সংরক্ষণের অসুবিধা ও ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার জন্য উৎপাদিত ফসলের কিছু অংশ নষ্ট হয়। ফলে খাদ্য ঘাটতি বৃদ্ধি পায়।

৭. **প্রাকৃতিক দুর্যোগ :** বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে খাদ্য উৎপাদন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে সাময়িকভাবে খাদ্য সমস্যা গুরুতর রূপ নেয়।

৮. **ত্রুটিপূর্ণ সরকারী নীতি :** সরকারী দাম নীতি, উপকরণ নীতি ইত্যাদি অনেক সময় উৎপাদন বৃদ্ধির পথে প্রণোদনা হ্রাস করে।

খাদ্য সমস্যা সমাধানের উপায়

বাংলাদেশে খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এ উভয় দিকে নজর দেয়া দরকার। নিচে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি :** কৃষকদের মধ্যে আধুনিক উপকরণের ব্যবহার – উন্নত বীজ, সার, সেচ ও কীটনাশক বৃদ্ধি করতে হবে। কৃষককে এই প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারে সক্ষম করার জন্য প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ সেবা বৃদ্ধি করতে হবে।

২. **খাদ্যশস্য ও বিক্রয়নীতি :** ক্ষুদ্র কৃষকেরা যাতে ফসলের উৎসাহ ব্যঞ্জক দাম পায় এজন্য সরকার ফসল কাটার মৌসুমে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে এবং যে সময় বাজারে খাদ্যের যোগান ক্ষীণ হয় সে সময় সংগৃহীত খাদ্য বাজারে বিক্রয় করতে পারে। এর ফলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকেরা উপকৃত হবে।

৩. **বিপণন ব্যবস্থার উন্নতি :** বিপণন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য স্বল্প মূল্যে কৃষকেরা চাহিদামত গুদামঘর নির্মাণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রাথমিক বাজারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা দরকার।

৪. **কৃষি গবেষণা জোরদার :** নতুন উন্নত জাতের বীজ উদ্ভাবনের জন্য কৃষি গবেষণা জোরদার করা যায়।

৫. **প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা :** প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবেলা করার জন্য দীর্ঘকালীন ও স্বল্পকালীন ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। বন্যা প্রতিরোধী ও খরা প্রতিরোধী বীজ উদ্ভাবন, দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন কর্মসূচী ইত্যাদির মাধ্যমে খাদ্য শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

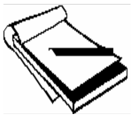

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে খাদ্য সমস্যার কারণ কোনটি?
ক. জনসংখ্যা বৃদ্ধি
খ. আধুনিক প্রযুক্তি প্রসারের মন্থর গতি
গ. প্রাকৃতিক দুর্যোগ
ঘ. উপরের সব কটি

২। বাংলাদেশে খাদ্য সমস্যা সমাধানের উপায় কি?
ক. খাদ্য উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি
খ. উপযুক্ত খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বিতরণ নীতি গ্রহণ
গ. খাদ্যশস্য বিপণন ব্যবস্থার উন্নতি বিধান
ঘ. উপরের সব কটি

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে খাদ্য সমস্যার কারণ উল্লেখ করুন।

২। বাংলাদেশে খাদ্য সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ উল্লেখ করুন।

পাঠ - ৬ : কৃষি ঋণ — ঋণের উৎস ও কাঠামোগত ত্রুটি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- কৃষি ঋণের উৎস সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- কৃষি ঋণের কাঠামোগত ত্রুটি সম্পর্কে বলতে পারবেন।

কৃষি ঋণের উৎস

কৃষি কাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য কৃষকরা যে ঋণ নেয় তাকে কৃষি ঋণ বলে। উৎপাদনের জন্য উপকরণ ক্রয়, পণ্য বাজারজাতকরণ ইত্যাদি কাজের জন্য কৃষক কৃষি ঋণ নেয়। বাংলাদেশে কৃষি ঋণের উৎসসমূহকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায় : ১. প্রাতিষ্ঠানিক উৎস বা সংগঠিত উৎস এবং ২. অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস বা অসংগঠিত উৎস। ঋণদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন – বাংলাদেশ ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক প্রভৃতি কৃষি ঋণের প্রাতিষ্ঠানিক উৎস। অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ব্যক্তি যেমন – আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, গ্রাম্য মহাজন ইত্যাদি। নিচে কৃষি ঋণের উৎসের একটি তালিকা দেয়া হল :

কৃষি ঋণের উৎসমূহ

প্রাতিষ্ঠানিক উৎস	অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস
১. বাংলাদেশ ব্যাংক	১. আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব
২. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	২. গ্রাম্য মহাজন
৩. রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	৩. গ্রাম্য ব্যবসায়ী ও দোকানদার
৪. বাণিজ্যিক ব্যাংক	৪. দালাল ও বেপারী
৫. বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ	৫. অবস্থাসম্পন্ন কৃষক
৬. বি, আর, ডি, বি	
৭. গ্রামীন ব্যাংক	

কৃষি ঋণের উৎসের কাঠামোগত ত্রুটি

কৃষি ঋণের কাঠামোগত ত্রুটিসমূহ নিচে আলোচনা করা হল :

১. **অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসের প্রাধান্য :** কৃষি ঋণের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস দু'টির মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে বিতরণকৃত কৃষি ঋণের হিসাব পাওয়া যায়। যেমন – ১৯৯৫-৯৬ সালে প্রাতিষ্ঠানিক উৎসসমূহ থেকে মোট ১৪৮১.৬৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে প্রাপ্ত ঋণের সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। তবে অনেকের মতে কৃষি ঋণের শতকরা ৮০ ভাগ অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে আসে। অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক উৎসসমূহ কৃষি ঋণের প্রয়োজনের মাত্র পাঁচ ভাগের এক ভাগ মেটাতে সক্ষম।

২. **অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সুদের হার বেশি :** প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সুদের হারের তুলনায় অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সুদের হার অত্যন্ত বেশি। যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক সুদের হার ১৬% সেখানে অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সুদের হার ৫০% থেকে ৩০০% হতে পারে। এত উঁচু হারে ঋণ নিয়ে খুব কম উৎপাদনমূলক কাজই লাভজনক হতে পারে।

৩. **অনাদায়ী ঋণ :** প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে বিতরণকৃত ঋণের একটি বিরাট অংশ অনাদায়ী রয়েছে। এর সূচনা ঘটে ১৯৭৭ সালে যখন প্রকল্পের ঋণযোগ্যতা যাচাই না করে বিপুল পরিমাণ অর্থ অতি দ্রুত ঋণ দেয়া হয়। পরবর্তীকালে সরকার মাঝে মাঝে কৃষি ঋণ মওকুফ করে দেয়। এর ফলে ঋণগ্রহীতা কৃষক ঋণ মাফ পাওয়ার আশায় ঋণ খেলাপী হতে উৎসাহিত হয়। অনাদায়ী ঋণের ফলে ঋণের প্রচ্ছন্ন ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং ঋণদানের তহবিল হ্রাস পায়।

৪. **দুটি উৎসের মধ্যে আন্তযুক্ততা :** প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ নিয়ে বড় কৃষক বা গ্রামের ক্ষমতাবান ব্যক্তি আবার অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস হিসেবে কাজ করে। গ্রামের ক্ষুদ্র বা মাঝারি কৃষক যারা নানাবিধ জটিলতার কারণে প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ নিতে ব্যর্থ হয় তারা এদের কাছ থেকে ঋণ নেয়। এভাবে দু'টি উৎসের মধ্যে আন্তঃযুক্ততা দেখা যায়। তবে এটি মন্দের ভাল এজন্য যে, এভাবে অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসে ঋণের সরবরাহ বেড়ে গেলে এ উৎসের সুদের হার কমে যাবে।

৫. **ঋণের অপ্রতুলতা :** কৃষি উন্নয়নের জন্য যে পরিমাণ অর্থায়ন প্রয়োজন তার তুলনায় বর্তমান কৃষি ঋণ অপ্রতুল। একথা উভয় উৎসের ক্ষেত্রের জন্যই প্রযোজ্য। উপরন্তু বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কৃষি ঋণ বিতরণের জন্য যে লক্ষ্য নির্ধারণ করে তাও বেশিরভাগ সময় অর্জিত হয় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

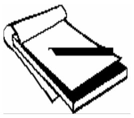

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে কৃষি ঋণ দেয় না –

ক. বাংলাদেশ ব্যাংক   খ. বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক

গ. রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক   ঘ. জাতীয়কৃত বাণিজ্যিক ব্যাংক

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। কৃষি ঋণের উৎসের কাঠামোগত ত্রুটি লিখুন।

পাঠ - ৭ : কৃষিজাত পণ্যের বিপণন — সমস্যা ও সমাধান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশে কৃষিজাত পণ্য বিপণনের সমস্যা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- কৃষিজাত পণ্য বিপণনের সমস্যার সমাধান সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বাংলাদেশে কৃষিজাত পণ্যের বিপণন সমস্যা

যে ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষিজাত পণ্য উৎপাদকের কাছ থেকে ভোক্তার কাছে সে যে স্থানে, সময়ে ও রূপে চায় সেভাবে পৌঁছে তাকে কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থা বলে। বিপণন ব্যবস্থার সঙ্গে নিম্নলিখিত কার্যাদি সংশ্লিষ্ট থাকে : সংগ্রহ ও একত্রীকরণ, শ্রেণীকরণ, গ্রেডিং ও মোড়ক বাঁধাই, গুদামজাতকরণ ও পরিবহণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বন্টন, পাইকারী ও খুচরা, অর্থায়ন, ঝুঁকি বহন, বিপণন তথ্য ও গবেষণা।

বাংলাদেশে কৃষিজাত পণ্যভেদে বিপণন সমস্যার কিছু পার্থক্য দেখা দেয়। তবে সব পণ্যের ক্ষেত্রেই কিছু সাধারণ সমস্যা আছে। এখানে সাধারণ বিপণন সমস্যাগুলো আলোচনা করা হল।

১. **অপ্রতুল বাজার সুবিধা :** কৃষিজাত পণ্য যথাক্রমে গ্রামীণ প্রাথমিক বাজার, সমাবেশ বাজার এবং মাধ্যমিক বাজারে কেনা বেচা হয়। এসব বাজারে বিশেষতঃ গ্রামীন প্রাথমিক বাজারে ভৌত অবকাঠামো খুবই দুর্বল। বিক্রেতারা স্থানের অভাবে ভালভাবে লেনদেন করতে পারেনা। তাছাড়া বাজারে টোল ও চাঁদা দিতে হয়। ফলে বিক্রেতার নীট দাম কম হয়।

২. **অনুন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা :** কৃষি পণ্যের বিপণনের জন্য সব ধরনের পরিবহণ ব্যবস্থা ব্যবহার করা হয় যেমন – মাথার উপরে করে বহন, গরুরগাড়ী, ভ্যান, ট্রাক, রেলপথ, জলপথ ইত্যাদি। এর মধ্যে সড়ক পথ ও জলপথে বেশির ভাগ পণ্য পরিবহণ করা হয়। কিন্তু বর্তমান পরিবহন ব্যবস্থায় পণ্য পরিবহণে যথেষ্ট সময় বেশি লাগে ও খরচ বেশি পড়ে। উল্লেখ্য যে, বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের ফলে উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের কৃষি পণ্য পরিবহণে যথেষ্ট সুবিধা হয়েছে।

৩. **গুদামজাতকরণ ও সংরক্ষণের অসুবিধা :** কৃষকের পর্যায়ে অথবা বাজারের পর্যায়ে উভয় ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত খাতে কৃষিজাত পণ্য সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত সংরক্ষণ ও গুদাম সুবিধার অভাব রয়েছে। এর ফলে শস্য সংরক্ষণ সম্ভব হয় না বা সংরক্ষিত শস্য পোকা, ইঁদুর ইত্যাদির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অবশ্য বাংলাদেশে বেশ কিছু হিমাগার নির্মিত হয়েছে এবং এর ফলে আলু সারা বছর সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে।

৪. **ত্রুটিপূর্ণ ওজন ও পরিমাপ :** বাংলাদেশের সর্বত্র ত্রুটিপূর্ণ ওজন ও পরিমাপ ব্যবহার করা হয়। ফলে কৃষকেরা প্রতারিত হয়।

৫. **বাজার কাঠামো :** সাধারণভাবে দেখা যায় যে কৃষি পণ্যের ব্যক্তিগত বাজার প্রতিযোগিতামূলক। বিভিন্ন পর্যায়ে ছোট ব্যবসায়ী, ফড়িয়া, পাইকার, মিল মালিক, প্রক্রিয়াকারী, যে মুনাফা করে তার হার বেশি নয়। এবং প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চল থেকে শহর পর্যন্ত পণ্য পৌঁছাতে কয়েক পর্যায়ের ব্যবসায়ীরই প্রয়োজন হয়। অবশ্য সরকার যেখানে বাজার নিয়ন্ত্রণ করে সেখানে নানারূপ পার্শ্ব লেনদেন দেখা যায়।

৬. **বিপণন ঋণের অভাব :** বিপণনের বিভিন্ন পর্যায়ে, যেমন – সংরক্ষণ, পরিবহণ, প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি, অর্থের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এরূপ ঋণের ব্যবস্থা নেই কিংবা থাকলেও তা খুবই অপ্রতুল।

৭. **বাজার অর্থের অভাব :** কৃষিপণ্যের দামের তথ্য রেডিও এবং খবরের কাগজের মাধ্যমে প্রচারিত হয়। কিন্তু অনেক কৃষক এই তথ্যের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তারা প্রতিবেশী কৃষক কিংবা ব্যবসায়ীর নিকট থেকে সাধারণতঃ তথ্য পায়। অবশ্য বড় ব্যবসায়ীরা টেলিফোনের মাধ্যমে অতি সহজে দেশের বিভিন্ন স্থানে পণ্যের বাজারের দামের তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।

কৃষিজাত পণ্যের বিপণন সমস্যার সমাধান

বাংলাদেশে কৃষিজাত পণ্যের বিপণন সমস্যার সমাধানের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। এর ফলে কৃষক তার পণ্যের ন্যায্য দাম পাবে এবং ভোক্তার প্রদেয় দামও কমে যাবে।

১. **বাজার ও পরিবহণ সুবিধার উন্নয়ন :** গ্রামের প্রাথমিক বাজার, সমাবেশ বাজার ও মাধ্যমিক বাজার ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন কৃষক ও ব্যবসায়ীদের চাহিদা অনুসারে করতে হবে। এ বাজারসমূহ পরস্পরের সঙ্গে এবং উৎপাদন এলাকার সঙ্গে যুক্ত করার জন্য রাস্তাঘাট ও সড়ক নির্মাণ করা প্রয়োজন। এছাড়া বাজারে যেন বেশি উপশুল্ক বা চাঁদা আদায় না করা হয় এবং ওজন যেন সঠিক হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

২. **সরকারের খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বিতরণ :** সরকার কৃষককে ধান ও গমের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার জন্য শস্য কাটার মৌসুমে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় এর সুফল ব্যবসায়ী ও সরকারী কর্মচারীগণ বেশি ভোগ করেন, কৃষক অল্পই সুবিধা পায়। সরকারের খাদ্যশস্য সংগ্রহ ব্যবস্থা পরিবর্তন করে যে কোন ব্যক্তির নিকট থেকে কেনা উচিত।

সরকার কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর অধীনে যে সময় গম বিতরণ করে সে সময় দেশে গম কাটা হয়। এর ফলে ঐ সময় গমের বাজারদাম নিচে নেমে যায়। সরকারের উচিত কাজের বিনিময়ে নগদ অর্থ প্রদান অথবা কর্মসূচীর সময় পরিবর্তন করা।

৩. **গুদাম ও ঋণ :** শস্য সংরক্ষণের সময় শস্যের যেন ক্ষতি না হয় এজন্য সরকার গুদামঘর নির্মাণ করতে পারে এবং শস্য গুদামে মজুত রাখার বিপরীতে ঋণ দিতে পারে। সরকারের শস্য গুদাম ঋণ প্রকল্প এ ব্যাপারে একটি যুক্তিযুক্ত পদক্ষেপ।

৪. **চুক্তিমাফিক উৎপাদন :** বাংলাদেশে তামাক উৎপাদনের ক্ষেত্রে চুক্তিমাফিক উৎপাদন ব্যবস্থা চালু আছে। এ ব্যবস্থা অনুসারে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো তালিকাভুক্ত উৎপাদকদেরকে ধারে সব ধরনের উপকরণ ও বিনামূল্যে সম্প্রসারণ সেবা দেয়। উৎপাদক তার ফসল কোম্পানির ক্রয়কেন্দ্রে নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করে এবং উপকরণের দাম বাদ দিয়ে যে মূল্য হয় তা পায়। এরূপে চুক্তিমাফিক উৎপাদন অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রে প্রবর্তন করা যায়।

৫. **কৃষি বিপণন বিভাগ পুনর্গঠন :** কৃষি বিপণন বিভাগ কৃষিপণ্যের দামের তথ্য সংগ্রহ করে। কিন্তু জেলাস্তরের নিচে এই বিভাগের কোন কর্মচারী নেই এবং জেলাস্তরের কর্মচারীও স্বল্প বেতনে নন-গেজেটেড কর্মকর্তা। এই কর্মচারীর পদমর্যাদা প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার সমান হওয়া উচিত এবং দামসহ দামের বিস্তার, উঠানামা ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার করা উচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

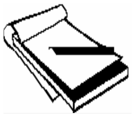

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। নিচের কোনটি কৃষিজাত পণ্যের বিপণন সমস্যা ?
ক. অপ্রতুল বাজার সুবিধা　　খ. বিপণন ঋণের অভাব
গ. ক ও খ উভয়ই　　ঘ. ক ও খ কোনটিই নয়।

২। কৃষিজাত পণ্যের বিপণন সমস্যা সমাধানের জন্য নিচের কোন ব্যবস্থাটি নেয়া যেতে পারে?
ক. কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি　　খ. শস্য গুদাম ঋণ প্রকল্প
গ. কৃষকদেরকে ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের জন্য ঋণদান
ঘ. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানো।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে কৃষিজাত পণ্যের বিপণন সমস্যা লিখুন।

২। বাংলাদেশে কৃষিজাত পণ্য বিপণন সমস্যার সমাধানের উপায় লিখুন।